আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

# কালো প্রজাপতি ও ডুবন্ত পরিত্রাণ

প্রথম দৃশ্য…সবটাই আচমকা…ডুবন্ত নারী…কালো প্রজাপতি…নির্বাচিত কবিতা…বয়স্ক পরিত্রাতা…সাদা মেয়ে…রাগে ফেটে পড়া…বাবা…রাজনীতি…পরিত্রাতা প্রৌঢ়…কালো ছেলে…ছোট…গুলিতে হত…সোফা থেকে খাট…প্রেম…পরিণতি…কালো প্রজাপতি…অশ্রু…নেশা…নির্বাচিত কবিতা…নষ্ট ভ্রূণ…কেনই বা কবিতা…বহুপ্রেম…শরীর শরীর…কালো বাচ্চা…নেলসন ম্যান্ডেলা…প্রথম গণতন্ত্র…পেছনের সীটে মরা…ডুবন্ত মেয়ে…সাদা…কালো প্রজাপতি… ভাষা ‘আফ্রিকান’…ম্যান্ডেলা পড়ছেন –

ও শিশু মরেনি
সে তার মায়ের বিরুদ্ধে মুঠি তোলে
কে চেঁচায় আফ্রিকা! চিৎকার করে প্রশ্বাস
স্বাধীনতার প্রশ্বাস, আর কর্ডন করে রাখা হৃদয়ের
উপত্যকা ঘাসজমি
…

২৪শে মে, ১৯৯৪। সদ্য বর্ণবিদ্বেষ অপসারিত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত লোকসভায়, নেলসন ম্যান্ডেলা পড়েছিলেন ‘ও শিশু মরেনি’ (মূল ‘আফ্রিকান’ ভাষায় শীর্ষক Die Kind) নাম্নী কবিতা। প্রসঙ্গ তুলেছিলেন সাদা মেয়েটির। যিনি এই কবিতার কবি। ম্যান্ডেলা সেদিন বলেছিলেন – ‘ইংগ্রিড জঙ্কার এক জাত আফ্রিকান কবি। সত্যিকারের অমর জাতীয় কবি…’। এদিনের আলো, ম্যান্ডেলার উচ্চারণ ইংগ্রিড শুনে যেতে পারেননি। কিন্তু সেদিন থেকে, বিশেষ করে, তাঁর সাহিত্যিক দ্যুতি ও ছায়া সাহিত্যের সীমাবদ্ধ চরাচর ছাড়িয়ে জীবনদৈত্যের চেয়েও অনেক বড়ো হয়ে যায়।

সাগরপাড়ে যুবতী ইংগ্রিড জঙ্কার

দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৬০-এর দশক। বর্ণবিদ্বেষে জ্ব'লে সাদাকালো, অন্য কোনো রঙ নেই। কিন্তু নিসর্গ, প্রকৃতি, মানুষের সমাজমনের কথা বোঝেনা। সে তার নিজের খেয়ালে নানারঙা কখনো, কখনো ধূসর রঙের শেডে। এমনই এক রোদেলা দিনের সাগরসৈকত। একটা ফাঁকা অঞ্চলে ছুটছিলেন মধ্যবয়সী জ্যাক। আচমকা মানুষের ডাকে দেখতে পান পাড় থেকে সোয়া মাইল দূরে একজন ডুবে যাচ্ছে। একটা মেয়ে। জ্যাক জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে পাড়ে নিয়ে আসে। মেয়েটির জ্ঞান ছিলো। নতুন যুবতী। নম্র ও স্বাধীনচেতা। তাদের আলাপের মাঝে তার বোন তাকে ডাকতে আসে। ডাক শুনে জ্যাক তার নাম জেনে যায় – ইংরিড। তাদের গাড়িটা চিনতে পারে। এ তো বিখ্যাত লোকের গাড়ি মনে হচ্ছে! ইংরিড? কবি ইংরিড জঙ্কার? লোকসভার সম্ভ্রান্ত সদস্য আব্রাহাম জঙ্কারের মেয়ে!

ইংগ্রিড জঙ্কার

আর ইংরিড জানতে পারে এই জ্যাক আসলে সফল ঔপন্যাসিক জ্যাক কোপ। ডুবন্ত কবিকে বাঁচিয়ে দিলেন ঔপন্যাসিক। এর যে কতরকমের সদর্থ হয়! কিন্তু এখানে, কেপটাউনের এই তটে এ তথ্যের রূপকিতা কম, বাস্তবতা বেশি। এই বেঁচে ওঠা কদিনের মধ্যেই তীব্রতর এক বেঁচে ওঠায় বদলে যায়। সবে বাচ্চা হয়েছে ইংরিডের, বাপের বাড়িতে সে বাচ্চাকে নিজে সামলাচ্ছেন। বর অন্য শহরে। সে ফিরে এলে বচসা বাড়ে, বাবার অবাধ্য হয়ে ইংরিড সেই অনুনয়ী স্বামীকে ত্যাগ করে।

সাগর এক নিয়মিত প্রেক্ষাপট ইংরিডের কবিতায়, অল্প বয়স থেকেই। সৈকতে অনেকটা সময় কাটে। বালি, জল, ফেনা, মানুষ ভালোলাগে। এই প্রেক্ষাপটে লেখা প্রথম জীবনের একটা সাধারণ কবিতা এইরকম –

**গ্রীষ্মারম্ভ**

শুরু করো গ্রীষ্ম, সমুদ্র
ফাটা কুইন্স [1]
শিশুর বেলুনের মতো
আকাশ
জলের বহু ওপরে

রঙিন ছাতার নিচে
লাইনটানা কাঠি-লজেন্সের মতো
পিঁপড়ে মানুষ
আর সৈকতের উদাত্ত হাসির
দাঁত সোনার

হলুদ বালতি নিয়ে বাচ্চাটা
আর তার ভুলে যাওয়া বিনুনি

তোমার হাঁ-মুখটা না ঠিক একটা ছোট্ট ঘন্টা
আর জিভ যেন তার ভেতরে টং-টং করা ক্ল্যাপার
তুমি সারাদিন রোদ্দুরে বাজো, খেলো
য়্যুকুলেলির মতো

---

[১] ‘কুইন্স’ বা ‘কুইন্টস’ (quince) এক এশীয় গাছ যাতে সুগন্ধী, গোলাপী পেয়ারাসম ফল হয়।

সহর্ষ ইংগ্রিড

ডুবন্ত জীবন ভেসে ওঠার পর, কবির সাথে পরিত্রাতা ঔপন্যাসিকের আলাপ হবার পর, কতদূর গড়ায় সে সম্পর্ক? কিছু বই, উপহার নিয়ে একদিন ইংরিড হাজির জ্যাকের বাড়িতে, পার্টিতে। সেখানে আলাপ বাড়ে আরো কিছু কবি, লেখক, শিল্পীর সাথে। জ্যাক কৃষ্ণাঙ্গদরদী, গোপনে সারাক্ষণই কোনো না কোনোভাবে কালো লেখক-শিল্পীকে সাহায্য করে। তাদের বইপত্র ছাপাবার ব্যবস্থা করে প্রকৃত গুপ্তপ্রেস থেকে। গভীর রাতে শহরের কত অংশে সারাবছর কার্ফু - কালোদের জন্য। তারই মধ্যে জ্যাক এক একদিন তাদের পৌঁছে দেয় নিরাপদ আস্তানায়। জ্যাককে ক্রমশ ভালোলাগে ইংরিডের। জ্যাক তখন পঞ্চাশ ছুঁই-ছুঁই। বিবাহ-বিচ্ছেদের মাঝে। ছেলেরা যুবক। কিন্তু ইংরিড কামোত্তাল এক যুবতী। সার্বিক প্রগতিশীল, তার ওপর যৌনতা বাঁধভাঙা। নৈতিকতার মুখে আগুন। জীবনে প্রথম হয়ে প্রকৃত প্রেম আসে। শরীরের সাথে মনও পাল তোলে। সাহিত্যিক যুগলের লেখারও উপকার হতে থাকে, সঙ্গীর সান্নিধ্যে। এসময়েই ইংরিড লিখছেন -

### তোমার মুখ

তোমার মুখ বাকী সবার মুখ
তোমার আগে যারা, পরে যারা সবার
আর চোখ তোমার শান্ত নীল এক
ভোর যা সময়ের দানা ভাঙছে সময়ের ওপর
মেঘপালকেরা
শ্বেতচিত্রাভ সুন্দরের প্রহরী
তোমার মুখের সুনির্মল ভূখন্ড
যা আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি
একটা হাসিকে গোপন করে রাখে
পাহাড়ের পেছনের ছোট সাদা গ্রামের মতো

আর তোমার হৃদস্পন্দনের মাপ
তার উচ্ছ্বাস
প্রারম্ভ কোনো প্রশ্ন নয়
অধিকার কোনো প্রশ্ন নয়
মৃত্যু কোনো প্রশ্ন নয়
আমার প্রেমিকের মুখ
ভালোবাসার পট

পাশাপাশি আসছে সংঘাত। ইংরিড শরীরের, অনুভূতির খরস্রোতা অশ্বিনী। কামনার তো বটেই। সে নিজেকে সব সময় সামলাতে পারেনা। লাঞ্চ-টেবিলের নিচ দিয়ে সঙ্গোপনে সে জ্যাকের পাশে বসা তারই যুবক ছেলের কোলে পা তুলে দেয়, তার লিঙ্গ ঘষতে থাকে। জ্যাকের চোখে পড়ে যায়। ফলত শৈত্য, দূরত্ব, বচসা; বাবা আব্রাহাম জঙ্কার বুড়ো ও অতিরিক্ত কৃষ্ণদরদী জ্যাকের সাথে মেয়ের মেলামেশা মানতে পারেন না; ইংরিড ফেটে পড়ে, বাড়ির পাশে কৃষ্ণাঙ্গ দাস-দাসীদের আউটহাউসে নিজের ঘর গড়ে নেয়। জ্যাক তাকে বোঝাতে আসে। সে মানে না, শরীরের আদুরে আক্রমণে প্রৌঢ় জ্যাককে অস্থির করে তোলে। এর মধ্যে তার পেট হয়ে যায়; সামাজিক চাপে, নিজের দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খলার অভাবে ভ্রূণনাশ হয়। ইংরিড বিষাদকলে ধরা পড়ে যায়। পানের মাত্রা বাড়ে। এসবের মধ্যে যেটা মনে রাখা জরুরী, সেটা এই যে ইংরিড কিন্তু যেভাবে পারেন সতীর্থ কৃষ্ণাঙ্গ এক তরুণ লেখকের সমর্থনে কথা বলেন, এমন একজন যার বই তার নিজের বাবা নিষিদ্ধ করে দেয় লোকটা কালো, ঈশ্বর নাকি কালোদের স্বেচ্ছায় নিম্নবর্গের ক'রে তৈরি করেছেন, সেই অজুহাতে।

INGRID JONKER
Black Butterflies
Selected Poems

কালো প্রজাপতি, ইংগ্রিড জঙ্কারের মরণোত্তর নির্বাচিত কবিতা

আত্মিক যন্ত্রণা বাড়ছে। আন্দ্রে ব্রিঙ্ক নামে এক লেখকের সাথে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। যদিও সুখানুভূতিকে সরিয়ে দিয়ে মন ও মননের সর্বোচ্চ দখল করে গ্লানি, ক্ষোভ, নৈরাশ্য ও যন্ত্রণা। ২৩ বছর বয়সে ওঁর প্রথম বই বেরিয়েছিলো – ‘পলায়ন’। ৩০ বছর বয়সে বেরয় দ্বিতীয় বই, অনেক পরিণত, উদ্ধত ‘ধোঁয়া ও গৈরিক’। এই বইয়েরই একটা কবিতা -

### যাত্রা

এই যাত্রা তোমার ছবিটিকে ঝাপসা করে
রক্তাক্ত দেবদূতকে ছুঁড়ে দিয়েছে কুকুরের ভিড়ে
বিবর্জিত জমি আমার কপালের মতো
গোলাপের ক্ষত

আমি দেখতে চাই তোমার অর্গলমুক্ত হাঁটা
দেখতে চাই তোমার স্বাধীন উন্মুক্ত মুখ
পৃথিবীর ক্ষত হয়ে তোমার ভাঙা মুখের পাশে
শুকনো কাদার দাগ

অনুপস্থিতির নিশ্চক্ষু রাতে আমি কান্নার মাধ্যমে চেয়েছি
এক সত্যিকারের তারা নিয়ে তোমার আবাহন
কান্নার মাধ্যমে চেয়েছি ওই নীলাকাশ একটিবার
আর জীবনের থেকে শুনতে চেয়েছি মাত্র একটি নির্বাচিত শব্দ

তেতো দেবদূতের জ্বলন্ত শিখার অসত্য তোমার হাঁ-মুখে
দুটো ডাহুক রেখেছি তোমার দুই বাহুমূলের নিচে
আর গুপ্ত এক ক্রুশ এঁকেছি তোমার মুখের ওপরে
সেই লোকটার কথা ভেবে

তোমাকে ভেবে যার কথা কখনো একবার …

অল্প বয়সে লিখলেও, পরবর্তীতে ইংরিড জঙ্কার ইংরেজিতে লিখতেন না, লিখতেন দক্ষিণ আফ্রিকার স্থানীয় ভাষা ‘আফ্রিকান্স’-এ। আফ্রিকান্স ভাষাসাহিত্যে এক ঔজ্জ্বল্য আসছিলো ওঁর কলমে ভর করে – এ কথায় ষাটের দশকে তখন অনেকেই বলতে শুরু করেছেন। উপনিবেশিক ভাষা ও ভাষাসাহিত্যের প্রকোপ থেকে এই ভাষাকে নিজের মতো উন্নত করে তুলছিলেন যে লেখক কবিরা, তাঁদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা পেতে শুরু করেছিলো ইংরিড। প্রান্তিক কৃষ্ণাঙ্গ লেখকরাও সেটা পছন্দ করতেন। বিশেষত ইংরিড তার বর্ণবিদ্বেষী, রাজনৈতিক ক্ষমতাধারী বাবার প্রতিক্রিয়াশীল মেয়ে বলে।

২০১১ সালে প্রকাশিত ‘কালো প্রজাপতি’ চলচ্চিত্রের এক দৃশ্যে ইংগ্রিডের ভূমিকায় ক্যারিস ফ্যান হাউটেন

ষাটের মাঝামাঝি ইংরিড আফ্রিকান্স প্রকাশক ও বইবিক্রেতা সংগঠনের মানী সাহিত্য পুরস্কার পান ওঁর দ্বিতীয় বইয়ের জন্য। একই সঙ্গে অ্যাংলো-আমেরিকান কর্পোরেশনের সাহিত্যবৃত্তি। আন্দ্রে ব্রিঙ্ককে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপ সফরে যান। কিন্তু যাবার প্রাক্কালেই একটা বড়ো ভর্ৎসনা আসে বাবা আব্রাহামের

থেকে। আধা-সরকারী পুরস্কার আফ্রিকান্স প্রকাশক ও বইবিক্রেতা সংগঠনের। ইংরিড চেয়েছিলেন আব্রাহাম সেই সভায় যান মেয়ের পুরস্কারের আনন্দভাগী হিসেবে। কিন্তু সে প্রস্তাবনার উত্তরে আব্রাহাম মেয়ের হৃদয় ধ্বংস করলেন। বললেন – তুমি কবি না বেশ্যা! তোমার এর-তার সাথে শোয়াশুয়ির গল্প ছড়িয়ে, তোমার বদখদ কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে, তোমার অশালীন, উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের নজির দেখিয়ে আমাকে প্রতিনিয়ত লোকসভায় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা ভূলুণ্ঠিত করছে। আমি তোমার বাবা হিসেবে আর পরিচয় দিতে পারছি না।

আরো নানা কারণে মন ভাঙছিলো। ইয়োরোপ সফর যে খুব সফল হয়েছিলো তা বলা যায় না। ওসব দেশে খুব একটা উচ্চবাচ্য হয়নি ওঁর কবিতা নিয়ে। সফরের মাঝে আন্দ্রে ব্রিঙ্ক, যিনি ইংরিডকে বিয়ে করবেন বলে সবাই ভাবছিলেন, দেশে ফিরে আসেন। নিজের স্ত্রীর সাথে পুরনো সম্পর্ক মেরামত করতে। এর অনেক আগেই অবশ্য তীব্র বিষাদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভ্যালকেনবার্গ মনোচিকিৎসা কেন্দ্রে ইংরিড ছিলেন বেশ কয়েক মাস। ঠিক এইসময়েই একদিন ন্যায়াঙ্গায় রাস্তায় গাড়ির মধ্যে অপেক্ষা করাকালীন ইংরিড সেই দৃশ্যটা দেখেন।

কিছু কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের সামান্য প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বর্বর চেহারায় রুখে দাঁড়িয়েছিলো সাদা-পুলিশ। রাস্তা বন্ধ করার মুখে এক কৃষ্ণাঙ্গ দম্পতী তাঁদের গাড়ি নিয়ে একপাশ দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করছিলেন, তাঁদের থামাতে না পেরে পুলিশ আচমকা গুলি চালায়। পেছনের সীটে বসে থাকা কিশোর ছেলেটি মারা যায়। তার বাবা রক্তাক্ত ছেলেকে কোলে ক’রে গাড়ি থেকে নেমে পাগলের মতো ছোটাছুটি করতে থাকেন স্থানীয় কালোদের মাঝে। ছেলেটি ততোক্ষণে মারা গেছে। না, রাস্তার ওপাশের গাড়িতে বসে এই দৃশ্য দেখে চঞ্চল ইংরিড রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর গাঢ়-বিষাদের কুয়ো এতে আরো কয়েকশো গজ বসে যায়। আর বেরিয়ে আসে সেই কবিতা যা বহু বছর পর নেলসন ম্যান্ডেলা পড়বেন প্রথম স্বাধীন কৃষ্ণাঙ্গ লোকসভায়। যে কবিতা বর্ণবৈষম্যের বিরোধী ইশ্তাহারের মতোই আজ বহু বহু দেশে। দ্বিতীয় দফার অনুবাদ না করে ইংরেজী অনুবাদটাই এখানে সরাসরি তুলে দিলাম -

**The child is not dead**

The child is not dead
The child lifts his fists against his mother
Who shouts Afrika! shouts the breath
Of freedom and the veld In the locations of the cordoned heart

The child lifts his fists against his father
in the march of the generations
who shouts Afrika! shout the breath
of righteousness and blood
in the streets of his embattled pride

The child is not dead not at Langa nor at Nyanga
not at Orlando nor at Sharpeville
nor at the police station at Philippi
where he lies with a bullet through his brain

The child is the dark shadow of the soldiers

on guard with rifles Saracens and batons
the child is present at all assemblies and law-givings
the child peers through the windows of houses
and into the hearts of mothers
this child who just wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere
the child grown to a man treks through all Africa
the child grown into a giant journeys through the whole world
Without a pass

কেপটাউন, ১৯শে জুলাই, ১৯৬৫। এর কিছুদিন পরেই। সে রাত্রে অতিরিক্ত নেশা করে ইংরিড থ্রি- অ্যাঙ্কর-বে'র সৈকতে চলে যান। ফাঁকা সৈকত। কেউ দেখেনি, সম্ভবত স্বেচ্ছাতেই আস্তে আস্তে সাগরের মধ্যে প্রবেশ করেন ইংরিড। পরদিন ওঁর মৃতদেহ ভেসে ফিরে আসে। এক দশক আগের সেই ডুবন্ত মেয়েটিকে যিনি বাঁচিয়েছিলেন, সেই জ্যাক কোপই, এক বন্ধুর সাথে ইংরিডের সমস্ত নতুন ও প্রকাশিত লেখা থেকে সম্পাদনা করেন ওঁর মরণোত্তর নির্বাচিত কবিতা – কালো প্রজাপতি ।

আজ, ৫০ বছর পার করে এসে হয়তো ইংরিডের কবিতা তার সব অভিনবত্ব পচিয়ে ফেলেছে। তবু, স্বাভাবিক নানা কারণেই ওঁকে সিলভিয়া প্লাথের সাথে তুলনা করা হয়। ওঁর কবিতা, ওঁর জীবন, ওঁর মৃত্যু। সিলভিয়া আত্মহত্যা করেন দুবছর আগে, ওঁর শেষ বই 'এরিয়েল' এর কবিতা, যা মূলত অতিরিক্ত স্নায়ুপ্রবণ এক তীব্র বিষাদগ্রস্তার কবিতা, ইংরিডের শেষপর্বের লেখালিখির সাথে অনেকটা মেলে। তবু, ইংরিডের বিষণ্ণতার অনেক কারণ ছিলো, সমাজসচেতনতাও যার একাঙ্গ। সিলভিয়ার ক্ষেত্রে সেটা শুধুমাত্রই দাম্পত্য-অশান্তি। একসময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের খ্যাতনামা ব্যাটধারী জর্জ হেডলীকে বলা হলো 'কালো ব্র্যাডম্যান'। স্বভাবতই কথাটা সাদা চামড়ার ক্রিকেট-সাংবাদিকরা বলতেন। কেউ কেউ তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন – কেন ব্রাডমানকে 'সাদা হেডলি' বলা হবে না! বিশ্বযুদ্ধ দীর্ঘ বিরতি টেনে হেডলির ক্রীড়াজীবন শেষ করে দেয়। মাত্র ২২টা টেস্টে হেডলি সামান্য সময় নিয়ে দুহাজারের ওপর রান করেন ১০টা সেঞ্চুরীর সাহায্যে। গড় প্রায় ৭০। ব্রাডম্যান খেলেছিলেন ৫২টা টেস্ট। একইভাবে কেন সিলভিয়া প্লাথকে আমেরিকার 'ইংরিড জঙ্কার' বলা হবে না, সে প্রশ্ন অন্তত আমি তুললাম।

== ।। ==